بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ২৬ তাবুক, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় হুনাইনের গনিমতের মাল বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু তথ্য রয়েছে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন গনিমতের মাল বণ্টন করেছেন এবং মুজাহিদদের তাদের অংশও প্রদান করেন আর পুরো খুমুসের (বা পঞ্চমাংশের) মোটামুটি পুরোটাই তিনি মুআল্লাফাতুল কুলুব (তথা হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার)-এর জন্য কুরাইশ সর্দার এবং অন্যান্য আরব সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। কাউকে একশত উট দেন আর কাউকে পঞ্চাশটি উট দেন। অন্যদের এত বেশি পরিমাণে সম্পদ প্রদানের কারণে আনসার কিছু যুবক কষ্ট পায় এবং তারা ভাবে, তাদের সেবা ও আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা অন্যদের তুলনায় সম্পদ পাবার অধিকার বেশি ছিল। সুতরাং তারা বলা আরম্ভ করে,

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسولِ اللّٰهِ صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا ويَدَعُنا، وسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِن دِمائِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরাইশকে দান করছেন আর আমাদের বঞ্চিত রাখছেন। (অর্থাৎ এই ধারণা তাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়;) অথচ আমাদের তরবারি থেকে সেই শত্রুদের রক্ত ঝরছে।

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে কেউ একথাও বলেছিল যে, যখন অবস্থা কঠিন ও প্রতিকূল হয় তখন আমাদের ডাকা হয়, আর গনিমতের মাল আমাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দেওয়া হয়। এসব কথার খবর যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি আনসারের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদাকে ডাকেন। কতকের মতে এসব কথা অবগতকারী ব্যক্তিও হযরত সা'দই ছিলেন। তখন তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذٰلِكَ يَا سَعْدُ؟ অর্থাৎ, হে সা'দ! এ বিষয়ে তোমার অবস্থান কী? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমিও আমার সম্প্রদায়েরই একজন, আমাকেও এ বিষয়টি প্রভাবিত করতে পারে। এতে তিনি (সা.) সা'দকে বলেন, সমস্ত আনসারকে একত্রিত করো। সুতরাং সবাই একটি তাঁবুতে সমবেত হয়। কিছু মুহাজিরও সেখানে উপস্থিত হন। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি শুধু আনসারকে ডেকেছি; আর মুহাজিরদের সেখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি (সা.) আনসারকে সম্বোধন করে বলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের পক্ষ থেকে যে কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে– তা কী? আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর এ কথায় আনসারের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের বুদ্ধিমান লোকদের মাঝে কেউ এমন কোনো কথা বলে নি। তবে কিছু আবেগপ্রবণ যুবক বলেছে, আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরাইশের প্রতি অনুগ্রহ করছেন আর আমরা তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয়েছি; অথচ আমাদের তরবারি থেকে সেই শত্রুদের রক্ত ঝরে পড়ছে। তিনি (সা.) আনসারের প্রতি কৃত অনুগ্রহ ও দয়ার উল্লেখ করে আনসারের উদ্দেশ্যে বলেন, হে আনসার! আমি যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তখন কি আমি

তোমাদের পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাই নি? অতঃপর আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আর তোমরা বিক্ষিপ্ত ও দ্বিধাবিভক্ত জাতি ছিলে এবং একে অপরের শত্রু ছিলে; আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তোমরা দরিদ্র ও অভাবী ছিলে, আল্লাহ্ আমার কারণে তোমাদের সম্পদশালী ও ধনী করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যে কথাই বলতেন, আনসার তার উত্তরে বলতেন: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ অর্থাৎ, এসব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগ্রহ। তিনি (সা.) আনসারের পক্ষ থেকে এ উত্তর শুনে বলেন, তোমরা আমাকে উত্তর দিচ্ছো না কেন? তারা বলেন, হে আল্লহর রসূল (সা.)! আমরা কী উত্তর দেবো? মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা চাইলে আমাকে এ উত্তর দিতে পারো আর তোমাদের কথা সত্য হবে এবং তোমাদের কথা স্বীকৃত হবে। তোমরা বলতে পারো যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল এবং অস্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি। আর আপনি নিঃসঙ্গ ও নিরুপায় ছিলেন এবং লোকেরা আপনাকে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। তারা আপনাকে আপনার শহর থেকে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার ওপর বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বভার ছিল আর আমরা আপনার দুঃখ লাঘব করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ কথা শুনে কোনো আনসার কথা বলেন নি। সবাই মাথা নীচু করে তাঁর (সা.) কথা শুনছিলেন এবং লজ্জিত ছিলেন। তিনি (সা.) আনসারকে এটিও বুঝিয়ে বলেন, তিনি কেন কুরাইশের সাথে এমন আচরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা তো পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং ইসলাম ও ঈমান তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরাইশের অধিকাংশ লোক মক্কা বিজয়ের সময় নওমুসলিম ছিল। বরং অনেকে এমন ছিল যারা তখনও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয় নি। আর পুরাতন মু'মিনদের তুলনায় এই নওমুসলিমরা আত্মীয়তার সম্মান পাওয়া ও অনুগ্রহ লাভের বেশি হকদার ছিল, যেন ইসলাম তাদের অন্তরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর কুরাইশ এজন্যও এই অনুগ্রহের হকদার ছিল যে, বহু যুদ্ধে তাদের অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনস্তুষ্টি করা যেন তারা পুরোপুরি ইসলাম ও ঈমানের গণ্ডিতে চলে আসে।

অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি এটা পছন্দ করবে না যে, লোকেরা তো ছাগল, ভেড়া ও উট নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে? আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যে সৌভাগ্য নিয়ে ঘরে ফিরছ, তা তাদের নিয়ে যাওয়া জিনিসের চেয়ে অনেক উত্তম। তিনি (সা.) বলেন, যদি লোকেরা একটি উপত্যকা বা গিরিপথে চলে এবং আনসার অন্য উপত্যকা বা গিরিপথে চলে, তাহলে আমি আনসারের সাথেই চলতে পছন্দ করব। অর্থাৎ আমি আনসারের দলে যুক্ত হবো। তিনি বলেন, লোকেরা আমার বাইরের পোশাক আর আনসার আমার ভেতরের পোশাক, অর্থাৎ যে কাপড় শরীরের সাথে লেগে থাকে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, হে আনসার! আমার পর তোমরা অন্যদের তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার পেতে দেখবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরবে, যতক্ষণ না হাউযে কাউসারে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎ হবে। আর নেতৃত্ব তোমাদের লাভ হবে না। শেষে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আনসারের জন্য দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ্! আনসারের প্রতি দয়া করো, আনসারের সন্তানদের প্রতি দয়া করো এবং আনসারের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিও দয়া করো। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এ

ভাষণ দিচ্ছিলেন আর আনসার ক্রন্দনরত ছিলেন, এমনকি তাদের শ্মশ্রু অশ্রুতে ভিজে যায়। আর তারা এ কথাই বলতে থাকেন– رَضِيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ قِسْمًا وَحظًا অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর বণ্টন ও আমাদের প্রাপ্ত অংশে মনেপ্রাণে সন্তুষ্ট। অনেক সময় অসাবধানে বলা কথা সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। যদিও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর বণ্টনে আনসার যুবকরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল, তবে সবাই তা করে নি। কিন্তু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে এটি এমন অসন্তোষজনক বিষয় ছিল যে, আনসারকে চিরকাল এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন,

মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর কাছে আসে, ঈমানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হবার কারণে যাদের দৃষ্টি তখনও জগতের দিকেই ছিল। এরপর এক যুদ্ধে কিছু ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হলে মহানবী (সা.) সেই ধনসম্পদ ঐ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এক আনসারী যুবক কোনো এক বৈঠকে বলে বসে, আমাদের তরবারি থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে আর মহানবী (সা.) ধনসম্পদ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের দিয়ে দিয়েছেন। এ কথা তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি আনসারের জ্যেষ্ঠ নেতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন, আমার কানে এমন কথা পৌঁছেছে। (তখন) আনসার কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, এটি কোনো নির্বোধের কাজ। তিনি (সা.) বলেন, হে আনসার! এমনটি নয়। তোমরা বলতে পারো, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই সময় আশ্রয় দিয়েছিলাম যখন কেউ তাঁকে আশ্রয় দিচ্ছিল না এবং তাঁর শহরের লোকেরা তাঁকে বের করে দিয়েছিল। এরপর তাঁর জন্য সম্মান ও বিজয় ছিনিয়ে আনলে তিনি ধনসম্পদ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বিতরণ করে দেন। তখন আনসার অঝোরে কাঁদে আর বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা এমন কথা বলি না। তারপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা এই কথাটি অন্যভাবেও বলতে পারো আর তা এভাবে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন মক্কার সন্তান, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মদীনায় নিয়ে যান; অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতাবলে তাঁর জন্য মক্কা জয় করেন। সেসময় মক্কাবাসীদের ধারণা ছিল, তাদের সন্তান তারা ফিরে পাবে, কিন্তু মক্কাবাসীরা ভেড়া-ছাগল নিয়ে যায় আর মদীনাবাসীরা আল্লাহ্‌র রসূলকে নিয়ে তাদের শহর অভিমুখে চলে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, যদিও একথা একজন নির্বোধের মুখ থেকে বের হয়েছে, কিন্তু এর কারণে তোমরা আর এই জগতের শাসনক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। এখন তোমাদের সেবার প্রতিদান তোমরা হাউযে কাউসারেই পাবে। তিনি (রা.) বলছেন, দেখো! ইতিহাস সাক্ষী, তেরো শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে এবং চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হচ্ছে, [বরং সেটিও এখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে;] এই দীর্ঘ সময়ে প্রতিটি জাতিই ইসলামের বদৌলতে বাদশাহ্ হয়েছে, কিন্তু কোনো আনসারী বাদশাহ্ হতে পারে নি। কাজেই, কখনো কখনো একজনের কথা গোটা জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা তাঁর খুতবায় বর্ণনা করেন এবং এটি উল্লেখ করে জামা'তকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের জন্য তেমনই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি সেসময় ছিল। তিনি বলেন, যারা কোনো পদ লাভের অথবা সম্পদ ইত্যাদি পাবার উদ্দেশ্যে কুরবানী করে, তারা যেন কখনও আমার ডাকে অর্থাৎ যুগ-খলীফার আহ্বানে কুরবানী করতে না আসে। বরং তাদের আসা উচিত যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে কুরবানী করে। কেননা আমি তো নিজেই দুর্বল ও অসুস্থ মানুষ; আমি কারো অনুগ্রহের বোঝা বইতে পারব

না। বস্তুত আমি নিজের জন্য চাই না। যে আল্লাহ্ তা'লার জন্য দেয়– সে দিক; আল্লাহ্ তা'লাই তার প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর আস্থা রাখা উচিত। তিনি চাইলে এই জগতেই দিতে পারেন অথবা তিনি চাইলে পরকালে দেবেন। যাহোক, যে নিষ্ঠার সাথে কুরবানী করে, তার কুরবানী বৃথা যায় না। মু'মিনের কুরবানীকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। অতএব, কুরবানীকারী তারাই যারা আল্লাহ্‌কে দৃষ্টিপটে রাখে, জগৎকে নয়।

কাজেই সর্বদা কুরবানী ও পদলাভের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, তবেই তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত পুরস্কাররাজি লাভকারী হবে। এক বয়সে উপনীত হয়ে জামা'তের সদস্যদের মধ্যেও এই ধারণা জন্মায় যে, আমাদের এত অভিজ্ঞতা আছে, আমরা এত কাজ করেছি; এর পুরস্কার আমাদের পাওয়া উচিত, যা দেওয়া হয় না। তাদের ভাবা উচিত, তারা কি শুধু পার্থিব পুরস্কারই নিতে চায়, নাকি আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হতে চায়? আজ থেকে (যুক্তরাজ্যের) আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাও শুরু হচ্ছে। যেহেতু এই বয়সে এসে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনের কারণে এ ধরনের ধারণাও (মাথায়) আসে, তাই আনসারকেও আমি এ কথাই বলছি, যদি কারো মনে তার অভিজ্ঞতা ও সেবার কারণে এমন কোনো ধারণা জাগে, তাহলে সে যেন তা (মন থেকে) ঝেড়ে ফেলে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

তখন আরবের বেদুইনদের অধৈর্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। গনিমতের সম্পদ বণ্টনের সময় কিছু বেদুইন লোকও মহানবী (সা.)-এর চারপাশে ভিড় জমায় এবং ধনসম্পদ দাবি করতে থাকে। তাদের ভিড়ের কারণে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চাদর একটি কাঁটাযুক্ত ঝোপে আটকে যায় এবং কিছুটা ধাক্কাধাক্কিও হয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার চাদরটি তো আমাকে ফেরত দাও! এরপর কাঁটাযুক্ত গাছপালার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এই কাঁটার সমসংখ্যক উটও যদি আমার কাছে থাকত তাহলে সেগুলো আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না। বেদুইনদের এমন অভদ্র আচরণে তিনি (সা.) তাদের কোনো বকাঝকা করেন নি এবং অসন্তুষ্টও হন নি। বরং মুচকি হেসে উত্তমরূপে তাদের তরবিয়ত করেন এবং তাদেরকে ধনসম্পদও প্রদান করেন।

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভের পর পরাজিত শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জরিমানা এবং রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ধনসম্পদ জড়ো করার পর যে সম্পদ সামনে আসে তা প্রচলিত রীতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর ইসলামী সেনাদের মাঝে বিতরণ করার (কথা) ছিল। কিন্তু এবার তিনি এসব ধনসম্পদ মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করার পরিবর্তে মক্কার চতুর্দিকে বসবাসকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তাদের মাঝে তখনও ঈমান বা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় নি আর তখনও অনেকেই কাফির ছিল। তাছাড়া যারা মুসলমান ছিল তারাও সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের জন্য এ বিষয়টি একেবারেই নতুন বিষয় ছিল যে, এক জাতি নিজেদের ধনসম্পদ অন্য লোকদের মাঝে বিতরণ করছে। এ ধনসম্পদ বিতরণের ফলে তাদের হৃদয়ে পুণ্য ও খোদাভীতি সৃষ্টি হবার পরিবর্তে কারো কারো মধ্যে লোভলালসা আরো বৃদ্ধি পায়। তারা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে ভিড় করে আরো ধনসম্পদের দাবি জানিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। এমনকি ধাক্কাতে ধাক্কাতে তারা মহানবী (সা.)-কে একটি গাছের কাছে নিয়ে যায়। আর একজন তো তাঁর কাঁধে রাখা চাদরটিকে ধরে এমনভাবে মোচড়াতে আরম্ভ করে যে, তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকসকল! আমার

কাছে আরো কিছু থাকলে আমি তা-ও তোমাদের দিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ বা কাপুরুষ দেখতে পাবে না। এরপর তিনি (সা.) তাঁর উটটির কাছে যান এবং সেটির একটি পশম ছিঁড়ে তা উঁচিয়ে বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য হতে এই চুল পরিমাণও (কোনো কিছুর) আমার প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র আরবের বিধান অনুযায়ী সেই খুমুস বা পঞ্চমাংশ ছাড়া। আর এই পঞ্চমাংশও আমি আমার নিজের কাজে ব্যয় করি না, বরং তা-ও তোমাদের কাজকর্মের পেছনেই ব্যয় হয়ে থাকে। আর মনে রেখো! আত্মসাৎকারী কিয়ামত দিবসে এই আত্মসাতের কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে লাঞ্ছিত হবে।

লোকেরা বলে, মহানবী (সা.) রাজা-বাদশাহ্ হবার বাসনা রাখতেন। (বলুন তো!) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক কী এমন হয়ে থাকে ? কারো মাঝে কি এই শক্তি থাকে যে, সে বাদশাহ্‌কে এভাবে ধাক্কা দেবে? বা তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তার শ্বাস রোধ করবে? আল্লাহ্‌র রসূলদের ছাড়া এই দৃষ্টান্ত আর কে দেখাতে পারে? কিন্তু এভাবে সকল ধনসম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার পরও এমন কিছু পাষাণ হৃদয়ের মানুষ ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর এই বিতরণকে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন বলে মনে করত না।

গনিমতের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সাধারণ রীতি ছিল, গনিমতের সম্পদ থেকে তিনি 'খুমুস' অর্থাৎ পঞ্চমাংশ পৃথক করে রাখতেন, যা মহানবী (সা.) যেখানে উপযুক্ত মনে করতেন বিতরণ করতেন অথবা ব্যয় করতেন। অবশিষ্ট সাকুল্য (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ (যুদ্ধে) অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এর মধ্যে পদাতিক (সৈন্য) ও অশ্বারোহীদের জন্য পৃথক পৃথক অংশ থাকত। কিন্তু হুনাইনের যুদ্ধের গনিমতের সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে যখন কতিপয় আনসারের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন বা আপত্তি করা হয় যে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে কিছুই দেন নি বরং অন্যদেরকে দিয়ে দিয়েছেন, তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, তিনি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের গনিমতের সম্পদ থেকে কিছুই দেন নি? নাকি কেবলমাত্র তাদের (প্রাপ্য) অংশ দিয়েছিলেন এবং বাদবাকি সম্পদ অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন?

যাহোক, আমাদের গবেষক দল বলছে, আমরা সীরাতের প্রারম্ভিক এবং নির্ভরযোগ্য পুস্তকসমূহ দেখেছি। কোনোটিতেই পরিষ্কারভাবে এর কোনো উত্তর দেওয়া হয় নি। তবে জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে এটি জানা যায় যে, মহানবী (সা.) সকল অংগ্রহণকারীকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করেছিলেন। প্রত্যেককে চারটি করে উট অথবা চল্লিশটি ছাগল করে প্রদান করা হয় এবং অশ্বারোহীদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া হয়। এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) লোকদের মনোস্তুষ্টির লক্ষ্যে 'খুমুস' থেকে সম্পদ দান করে থাকবেন। কিন্তু এটিও হতে পারে যে, তিনি (সা.) সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কাউকেই কিছু দেন নি; অর্থাৎ সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয় নি, বরং সমস্ত সম্পদ অন্য লোকদের মাঝে প্রীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস ও বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থসমূহেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র একটি উদ্ধৃতি থেকেও এমনটিই মনে হয় যেভাবে এখনই বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, এই যুদ্ধসমূহের সমাপ্তিতে সেই সমস্ত সম্পদ যা পরাজিত শত্রুদের অর্থদণ্ড ও যুদ্ধেক্ষেত্রে ফেলে যাওয়া ধনসম্পদ একত্রিত করার পর সামনে আসে, অর্থাৎ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নিয়মানুযায়ী যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামী সেনাদলের মাঝে বণ্টন করার কথা ছিল কিন্তু তখন মহানবী (সা) তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করে মক্কা এবং তার আশপাশের লোকদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, মালে গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় এক মরুবাসী বেদুইন মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় আর বলতে থাকে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূর্ণ করুন। মহানবী (সা.) তার কথার উত্তরে বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। সেই বেদুইন বলে, আপনি তো অনেকবার এই কথাই বলেছেন যে, সুসংবাদ গ্রহণ করো, কিন্তু আপনি কিছুই দেন নি, কেবল বলতেই থাকেন। তার এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় মহানবী (সা.) অনেক কষ্ট পান। তিনি (সা.) তার দিক থেকে নিজের পবিত্র চেহারা ফিরিয়ে নেন আর সেখানে দণ্ডায়মান হযরত আবু মূসা আশআরী এবং হযরত বেলালের দিকে তাকিয়ে বলেন, সে তো সুসংবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সুতরাং এখন তোমরা তা গ্রহণ করো। তারা এ কথা শুনে তাৎক্ষণিক বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি (সা.) পানির একটি পাত্র আনান এবং সেটিতে নিজ হাত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন, এরপর তিনি (সা.) অবশিষ্ট পানি হযরত আবু মূসা আশআরী ও হযরত বেলাল (রা.)-কে প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা উভয়েই এই পানি পান করে নাও এবং তা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে মেখে নাও। আর সেইসাথে তোমরা আনন্দিত হও। তারা উভয়ে পানির পাত্রটি নিয়ে এমনটিই করেন।

এখানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং মহানবী (সা)-এর বরকতময় সত্তা থেকে আশিস অন্বেষণের এক অদ্ভুত ও ঈর্ষণীয় দৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। লিখিত আছে, পাশের তাঁবুতেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাও অবস্থান করছিলেন। ঘটনা থেকে বুঝা যায়, এ সমস্ত ঘটনা হযরত উম্মে সালামার তাঁবুর নিকটেই হচ্ছিল। তিনি (রা.) পর্দার পেছন থেকে তাদেরকে বলেন, নিজেদের মায়ের জন্যও কিছুটা পানি রেখে দিও। অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) দুইজন সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী এবং হযরত বেলালকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেন। সুতরাং তারা হযরত উম্মে সালামার জন্যও পাত্রে কিছু পানি রেখে দেন।

বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় ছাগলের অনেক বড়ো একটি পাল দেখতে পায়। সে মহানবী (সা.)-কে বলে, এই ছাগপাল আমাকে দিয়ে দিন। তিনি (সা.) কালক্ষেপন না করেই তা তাকে দিয়ে দেন। সে সেই ছাগলের পালটি নিয়ে তার জাতির কাছে গেল আর বলতে লাগল, হে লোক সকল! তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈমান আনো। তিনি এত অঢেল দান করেন যে, তার দরিদ্রতা ও ক্ষুধার কোনো ভয়ই নেই। সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, এই ঘটনাটি সেই সময়েরই একটি ঘটনা। এটি হাদীসে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াত। যাহোক, আরো অনেক ঘটনা আছে; ইনশাআল্লাহ্‌, পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কিছু প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করছি, যাদের জানাযাও জুমুআর পর পড়াবো।

প্রথমে যার কথা উল্লেখ করতে চাই তিনি হলেন মরহুম ফাহিমুদ্দীন নাসের সাহেব, যিনি রোমানিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মুসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ হযরত মির্যা ইলম দীন সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি পত্রযোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন

করেছিলেন। কাদিয়ানের নিকটে অবস্থিত একটি গ্রাম লোধি নাঙ্গলের মসজিদের ইমাম নূর মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এসে গ্রামে ঘোষণা দেন, ইমাম মাহদী এসে গেছেন আর তিনি সত্য, তাঁকে মেনে নাও। এরপর পত্রযোগে বয়আতকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে মির্যা ইলম দীনও ছিলেন।

ফাহিমুদ্দীন নাসের সাহেব ১৯৯৬ সালের জুন মাসে জামেয়া পাশ করেন, এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তাকে পদায়ন করা হয়েছিল এবং এরপরে কুরআনের তফসীরের ওপরও তিনি উচ্চতর অধ্যয়ন করেছেন। ২০০৬ সালে তাকে রোমানিয়ায় পাঠানো হয় আর আমৃত্যু তিনি সেখানে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার স্ত্রী নাসিরা ফাহিম লিখেছেন, তিনি একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন। আমার অনুভূতি ও আবেগ বোঝানোর জন্য আমার কিছু বলার আগেই তিনি বুঝে ফেলতেন। তিনি খুব দায়িত্বশীল পিতা ছিলেন। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় সম্পর্ক, তাওয়াক্কুল, ইবাদত, দোয়া, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা, ধর্মের সেবার আগ্রহ ও উৎসাহ, নিজ দায়িত্ব পালনের অনুভূতি এবং নির্ধারিত সময়ে সব কাজ শেষ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত এবং জামা'তী সব কাজের আগে যুগ-খলীফার কাছে চিঠি লিখতেন এবং দিকনির্দেশনা নিতেন। তিনি জামা'তের সদস্যদের এবং নিজের সন্তানদের সর্বদা নিজের কর্মের মাধ্যমে তরবিয়ত করতেন। বোঝানোর পদ্ধতি খুবই ভালো ছিল। সময় মতো নামায আদায়, তাহাজ্জুদ ও নফল পড়া তার অভ্যাস ছিল। অসুস্থতার সময়ও নামায আদায়ে তিনি মনোযোগী ছিলেন। শেষে যখন অসুস্থতা খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কথা বলাও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি ইশারায় বলেছিলেন, কাগজ নিয়ে আসো; আর লিখেছিলেন, ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া, প্রতিটি কষ্ট ও সমস্যায় তাঁর দরবারে মাথা ঝোঁকাবে। তিনি স্ত্রী ও সন্তানের উপদেশ দিয়েছিলেন, যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র দুয়ার ছেড়ো না। সবসময় বলতেন, শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে আর আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলো, শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করো। তিনি কখনো বিপদের মাঝে তোমাকে একা ছেড়ে যাবেন না।

তবলীগ ও জামা'তের পরিচয় করানোর সুযোগ কখনো হাতছাড়া করেন নি। জামা'তের পরিচিতি লিফলেট ও ফ্লায়ার সঙ্গে রাখতেন। হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে গেলে তাদেরও তবলীগ করতেন এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে, আমি ডাক্তারদেরও তবলীগ করেছি। সবসময় মুখে হাসি থাকত, খুবই মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার চরিত্রের কারণে সবাই তার প্রতি মুগ্ধ হতো। তার মৃত্যুর খবর শুনে মিশন হাউসের পাশের রোমানিয়ান প্রতিবেশীরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছিল, অনেক শোক প্রকাশ করেছিল। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি তার দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। এমনকি মৃত্যুর দুই দিন আগে শরীর অনেক দুর্বল থাকা ও শ্বাসকষ্ট হওয়া এবং খাবার খাওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি জামা'তের চিঠিপত্র লিখতে থাকেন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইলের উত্তর দেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, রোমানিয়ায় যেন জামা'ত শক্তিশালী হয়। আর দেশের পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে যথাযথ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। শিশুদের বলতেন, তোমাদের কাজ এবং কর্মপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন তা তবলীগের মাধ্যমে পরিণত হয়। রোমানীয় ভাষায় কুরআন করীম অনুবাদ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। প্রায় দেড় পারা অনুবাদ সম্পন্নও করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যস্ততা

থাকার কারণে কাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহের অনুবাদও করছিলেন।

বিভিন্ন দফতরের স্থানীয় রোমানীয় ব্যক্তিদের সাথে যখনই তিনি সাক্ষাৎ করতেন তখন রোমানীয়রা এ কথাই বলত যে, তার ভাষা অত্যন্ত বিনম্র ও মার্জিত, যেমনটি সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বলে থাকে। সেখানকার স্থানীয়রা বলেন, আমরা কোনো অরোমানীয় ব্যক্তিকে এতটা সুন্দর ও চমৎকারভাবে কথা বলতে দেখি নি। অনেক চমৎকার ভাষা ছিল তার।

তার মা সাফিয়া বেগম বলেন, মরহুমের নানা এবং নানি উভয়ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। মুরব্বী সাহেব উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। [সবাই এ কথাই লিখেছে।] সদাচরণ, ধৈর্য এবং ধর্মীয় কাজের প্রতি আকর্ষণ আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেছেন। তার মা বলেন, সে অত্যন্ত অনুগত পুত্র ছিল। তার পিতা তার জন্মের পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি একটি শিশু কোলে নিয়ে রেখেছেন আর তাকে দেখছিলেন যে, তার কপালে চাঁদ এবং তারা অঙ্কিত আছে। তার মা বলেন, যখন সে মুরব্বী হলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সে অবশ্যই একদিন সফল হবে।

২০০৬ সালে তিনি রোমানিয়ায় যান। রোমানিয়ার প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। আর তিনি সেখানকার ভাষা শিখেছেন এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিখেছেন। সেখানেই স্নাতক ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন। জামা'তের জন্য অনেক বড়ো বড়ো কাজ তিনি করেছেন। জামা'তকে রেজিস্টারভুক্ত করেছেন, মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ততক্ষণ তিনি প্রশান্ত হতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না দৈনিক কাজ সম্পন্ন করেন।

তার ভাই রাফিউদ্দিন বলেন, মেট্রিক পাশের পর কাউকে কিছু না জানিয়েই নিজ থেকেই জামেয়াতে যান। আর ওয়াকফের দায়িত্ব খুব চমৎকারভাবে পালন করেন, আর সত্যিকারভাবেই তা পালন করেছেন। ছুটিও নিতেন না কখনও। শুধুমাত্র একবার ছুটি নিয়েছিলেন। (তার ভাই) বলেন, ছুটি সেদিনই নিয়েছিলেন যেদিন তার ছোটো বোন মারা যায়। তার পুত্র মির্যা লাবীদ বলে, মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমার আশঙ্কা হয়, এই কোর্স আদৌ সম্পন্ন করতে পারব কিনা? আমাকে তিনি প্রতিদিন ফোন করে সাহস যোগাতেন। দরূদ শরীফ পাঠ, তাহাজ্জুদ পড়া, দোয়াসমূহ পড়ার হিতোপদেশ দিতেন। পরিশ্রম করার নির্দেশ দিতেন। আর এভাবেই তিনি আমাকে অনেক উৎসাহিত করেছেন। তার দ্বিতীয় পুত্র দানেশ বলেন, যে ব্যক্তিই তার সাথে একবারের জন্য সাক্ষাৎ করেছে, সে-ই তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে কেঁদে ফেলেছে আর বলেছে, তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, অত্যন্ত স্নেহশীল ব্যক্তি ছিলেন। লাটভিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, মরহুম অত্যন্ত পরিশ্রমী, সচ্চরিত্রবান এবং হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন। তার নম্রতা, বিনয় এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন সবাইকে তার ভক্ত বানিয়ে ফেলত। তার স্বভাবের মাঝে এক বিশেষ ধরনের উদ্যম থাকত। চেহারায় সর্বদা হাসি থাকত। তার দেশ রোমানিয়াতেই অন্যান্য কিছু দেশের ছাত্র পড়াশোনার উদ্দেশ্যে অবস্থানরত ছিল। ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। তাসভির জাভেদ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন, এখন ডাক্তার হয়েছেন; তিনি বলেন, ছাত্রদের আধ্যাত্মিক তরবিয়তের জন্য তিনি রেল বা বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভ্রমণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যেতেন যেখানে আহমদী ছাত্ররা পড়াশোনা করত। জামা'তের অর্থ সাশ্রয়ে তার খুব মনোযোগ ছিল, এমনকি কার্টন ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে নিজেরাই ডায়াস তৈরি করে ফেলতেন যেন জামা'তের অর্থ

সাশ্রয় হয়। প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়ও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করে নামায আদায় করেছেন। অত্যন্ত সহজসরল ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। আমাদের শিশুদেরও তিনি ভদ্রতা ও নম্রতা শেখানোর চেষ্টা করতেন।

রোমানিয়া থেকে এক ব্যক্তি আযীম রোমান শামস বলেন, পরীক্ষাগুলো খুব কঠিন ছিল, আমার সন্দেহ ছিল আমি পাস করতে পারব কিনা। কিন্তু মুরব্বী সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করতেন, তুমি চিন্তা কোরো না, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে আমি তোমাকে এমন কিছু মূল পয়েন্ট বোঝাবো যার ফলে ইনশাআল্লাহ্ তুমি সফল হবে; আর বাস্তবেই তার উপকার হয়।

রোমানিয়ার একজন নও-মুবাঈ আদীল আদ্রিয়ান মুসাত বলেন, আমি যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই, পরদিন তিনি আমাকে জামা'তের এক কাজে সহায়তা করতে বলেন, যার জন্য পাশের শহরে যেতে হবে। আমরা যখন কাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই তখন পথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করতে করতে এক সময় মুরব্বী সাহেব কিছুক্ষণের জন্য আবেগাপ্লুত হয়ে আমাকে বলেন, আল্লাহ্ না করুন, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি চাই এখানেই আমাকে দাফন করা হোক যেন এটি স্মরণে থাকে যে, আমি এখানে থেকেছি এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি। তারপর তিনি লেখেন, স্বাস্থ্য আরো খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবসময় ল্যাপটপে কাজ করতেন এবং নিজেই একটি চিঠি লিখে তার কাজ চালিয়ে যাবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। সবসময় আল্লাহ্র ধর্মের জন্য এবং অন্যদের জন্য বেশি চিন্তিত থাকতেন। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কথা ভাবেন নি। অতঃপর এই নও-মুবাঈ আরো লেখেন, আমি তাকে নিজের সময় ও ঘুম অন্যদের জন্য উৎসর্গ করতে দেখেছি। সবসময় এজন্য কৃতজ্ঞ থাকতেন যে, তিনি অন্যদের খেদমতের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি কখনো তার মুখে কারো সম্পর্কে সামান্যতম খারাপ কথাও শুনি নি। তিনি কেঁদে কেঁদে কেবল নিজের পরিবারের জন্য নয়, বরং আমাদের রোমানিয়া জামা'ত ও এর সদস্যদের জন্যও দোয়া করতেন। কখনো এক দিনের ছুটিও নেন নি এবং বেশি বিশ্রাম করতেও চান নি; কারণ তিনি বলতেন, নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে জামা'তের যথাসাধ্য খেদমত করাই তার দায়িত্ব, সেজন্য তার ঘুম বা স্বাস্থ্যের যতটা কুরবানী করারই প্রয়োজন হোক না কেন! সবসময় আল্লাহ্র ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতেন। অন্যদেরও প্রচুর দোয়া করতে বলতেন এবং আল্লাহ্র সাহায্যে আস্থা রাখতে উৎসাহিত করতেন। এই নও-মুবাঈ আরো লেখেন, মুরব্বী সাহেব আমার কাছে কেবল একজন ধর্মীয় শিক্ষকই ছিলেন না, বরং পিতার মতো ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার জন্য একজন অসাধারণ আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং খুব ভালো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই হলো একজন মুরব্বীর গুণাবলি– যেগুলো এই নও-মুবাঈ উল্লেখ করেছেন, আর এমনই শিক্ষা ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত তবলীগ ও তরবিয়তের পথকে সহজ করে তোলে ও সুফল বয়ে আনে। বিদেশে ধর্মের খাতিরে আত্মোৎসর্গ করেছেন– এই দিক থেকে তার মর্যাদাও একজন শহীদের সমান। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং অসাধারণভাবে পূরণ করেছেন। আমি নিজেও সবসময় তার মুখে হাসি দেখেছি।

মৌলবি উবায়দুল্লাহ্ সাহেব– যিনি মরিশাসে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে গোটা জামা'তকে এ নসীহত করেছিলেন যে, এ ধরনের লোকেরা শহীদের মর্যাদা লাভ করে থাকেন এবং মরহুমের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নিঃসন্দেহে মরহুম ফাহিম নাসের সাহেবের

অবদানও এমনটিই ছিল; আর তা ছিল আদর্শ যা এক শিক্ষা বহন করে, বিশেষভাবে ওয়াকেফে যিন্দেগীদের জন্য এটি শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার স্ত্রী, সন্তান এবং মা– সবাইকে ধৈর্য দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় আব্দুল আলীম ফারূকী সাহেবের। তিনি কানাডার অধিবাসী আব্দুর রশীদ ফারূকী সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তার মৃত্যু এভাবে হয়েছে যে, তিনজন সশস্ত্র ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করে। তিনি নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, স্ত্রী ও তিন সন্তান নীচে ছিলেন। তার পুত্রও নিজের ঘরে ছিল। ডাকাতদল তাদের সবার ফোন কেড়ে নেয়। মরহুম শোরগোল শুনে জাগ্রত হন। একজন ডাকাত তার ঘরে প্রবেশ করে। মরহুম ডাকাতকে ভয় দেখাতে চাইলে সে তার নাকে ও কাঁধে একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তখন মরহুম তার পুত্রের কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে একজন ডাকাত সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল; সে মরহুমকে লক্ষ করে দুটি গুলি চালায়। একটি গুলি মরহুমের হৃদপিণ্ডের কাছে বিদ্ধ হয়ে শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সান্নৌরী (রা.) এবং হযরত মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন (রা.)-এর প্রদৌহিত্র ছিলেন। জামা'তের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নিয়মিত পাঁচবেলার নামায এবং তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। ভীষণ উদ্যমী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। স্থানীয় সেক্রেটারি তবলীগ হিসেবে নিজ হালকায় সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ হয়েছে। সম্প্রতি তিনি হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার সহধর্মিণী ছাড়াও এক পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে।

মরহুমের আত্মীয় মিশনারি ইনচার্জ যাকারিয়া খান সাহেব লিখেছেন, তিনি অত্যন্ত পুণ্য স্বভাবের এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। মরহুমের স্ত্রী তাকে জানান, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। পাঁচবেলার নামায যত্ন সহকারে আদায় করতেন। প্রবল আগ্রহী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। নিজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও দিন-রাত জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। মরহুমের সহধর্মিণী মরিয়ম সাহেবা লিখেছেন, উত্তম স্বামী ছিলেন। তার কাছ থেকে আমি জীবনে বহু কিছু শিখেছি। তবলীগ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তবলীগ করার প্রতি আশ্চর্যজনক ঝোঁক ছিল। সবসময় তবলীগের নিত্যনতুন পরিকল্পনা বের করতেন আর সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতেন। খিলাফতের সাথে সম্পর্কের বিষয়েও তিনি লিখেছেন। প্রতিবেশীদের সাথে, এলাকাবাসীর প্রতি সদাচারী ছিলেন আর সবাই তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। প্রফুল্লচিত্তের দয়ার্দ্র মানুষ ছিলেন। ঘরে সর্বদা বাজামা'ত নামায আদায় করতেন, সন্তানদেরও এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

মরহুমের কন্যা স্নেহের উযমা বলেন, খুঁটিনাটি বিষয়াদি থেকে নিয়ে বড়ো বড়ো সকল প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন। সারা দিন হয় নিজের কাজে কিংবা জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাতে ঘুমানোর সময় আমাদের কক্ষে এসে খোঁজখবর নিতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, কীভাবে সময় কেটেছে, নামায প্রভৃতি আদায় করেছি কিনা। নিজের বিষয়েও গল্প করতেন। সর্বোপরি আমাদের সাথে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মরহুমের পুত্র স্নেহের কাযীম বলেন, আমাদের জন্য আমাদের পিতা অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্। সপ্তাহের

প্রত্যেক রবিবার আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হতাম। যেখানেই সুযোগ হতো তবলীগের স্টল খুলে বসতেন। তিনি আমাকে কুরআনও মুখস্থ করিয়েছেন। শাজার ফারূকী সাহেব- যিনি এখানে (অর্থাৎ ইংল্যান্ডে) আছেন- মরহুম তার ভাতিজা ছিলেন। তিনিও এগুলো লিখেছেন, মরহুমের সমস্ত গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়, পুণ্যময় স্বভাবের ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আর তিনি উমরাহ পালন করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সেখানেও লোকেরা বলেছে, আমরা সর্বদা তাঁকে ইবাদতে মগ্ন ও মনোযোগী দেখেছি যা প্রশংসার যোগ্য। মেয়েদের তরবিয়তের বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তিনি তার পনেরো বছরের মেয়ের ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাকে এখন ফোন দেওয়া উচিত হবে কিনা। পরবর্তীতে তিনি আমার নির্দেশনা পেয়ে সেই অনুসারে কাজ করেন। প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম খেয়াল রাখতেন। আবশ্যক চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক তাহরীকগুলোতে উৎসাহের সাথে বেশি বেশি অংশ নিতেন। পাকিস্তানেও তিনি দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য অনেক অর্থ প্রেরণ করতেন।

তার মা লেখেন, আমার সন্তান জামা'তের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিল, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখত। সবকিছুতেই সত্যকে প্রাধান্য দিত। ছোটো-বড়ো সবার সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করত। তবলীগের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রত্যেক রবিবার তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হতো। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ত এবং অন্যদেরও সাহায্য করত। বাজামা'ত নামায আদায় করার ব্যাপারে সে এতটা আন্তরিকতা রাখত যে, মাঝে মাঝে নিজ কর্মস্থল থেকে আমাকে ফোন করে বলত, আপনি যদি নামায না পড়ে থাকেন তাহলে অপেক্ষা করুন; আমি আসছি, আমরা একসাথে নামায পড়ব। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার মাতা এবং স্ত্রী-সন্তানদের ধৈর্য ধরার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকে তার উত্তম আদর্শ ও পুণ্যময় আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলার তৌফিক দিন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)